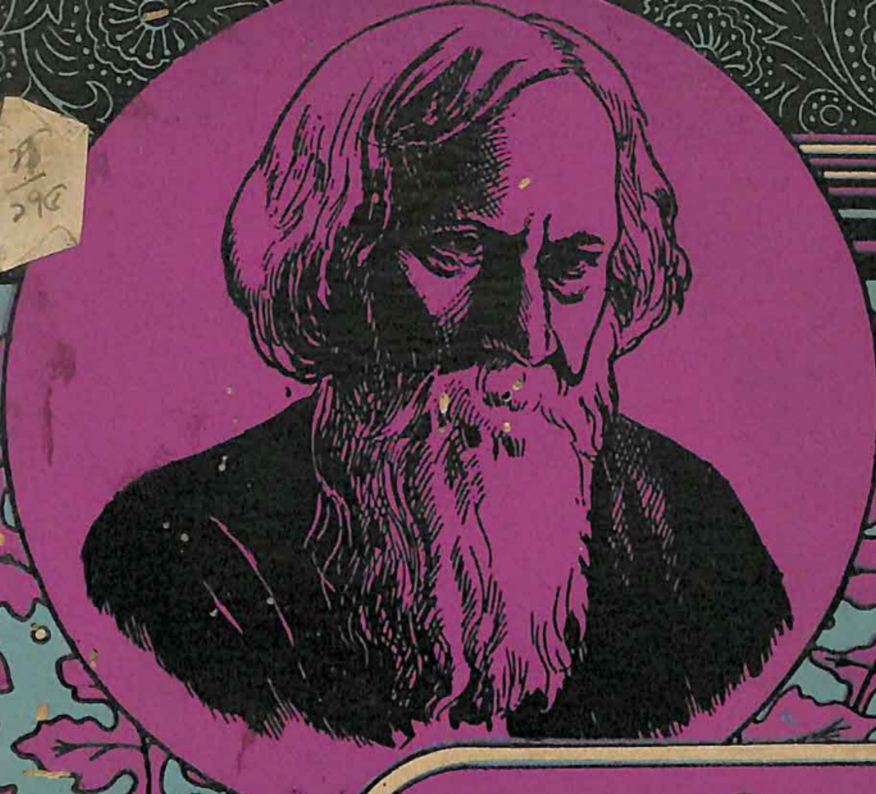
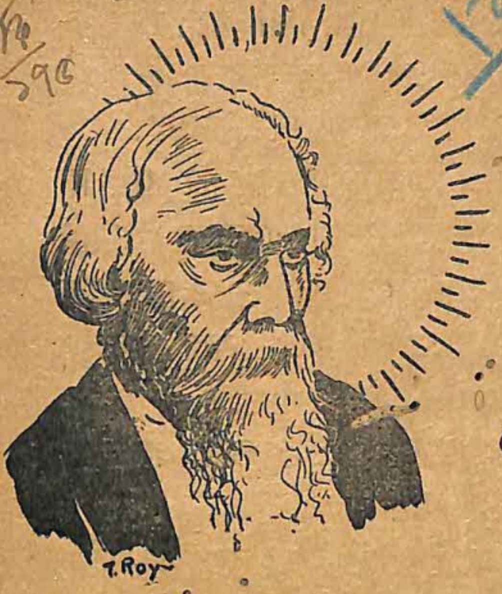


রবীন্দ্রনাথ

এম এল দে এণ্ড কোং
১৩-১ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা ১২



রবীন্দ্রনাথ

বংশ-পরিচয় ও জন্ম

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী। সাবেক কালের একটা প্রকাণ্ড বাড়ী। সম্মুখে মস্ত দেউড়ি। দেউড়িতে সেকেলে ধরণের ঢাল, বর্ষা, বাঁকা তলোয়ার টাঙ্গানো। ভিতরে ঠাকুরদালান, উঠোন ও অন্দরের বাগান। গোটা বাড়ীর কাঠামটাতে ছিল একটা বুনিয়াদি ছাপ। বাড়ীটাও ছিল যেমন বিরাট ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাড়ীর বাসিন্দা পরিবারটিও ছিল তেমনি বিশাল। তা'দের ভাব, ভাষা, চাল-চলন, শিক্ষার ধারা—সবই ছিল আলাদা। বাড়ীতে প্রবেশ করে' কয়েক ঘন্টা থাকলেই মনে হতো সেই প্রাচীন ভারতের উপনিষদের যুগের আর্য্যগণের বংশধর বুঝি এরাই। সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ীর ছেলে-বুড়ো সকলেই কি বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করে যেতো উপনিষদের শ্লোক।

ভাষা ও সাহিত্যেরও যেন হয়েছিল ত্রিবেণী-সঙ্গম এই বাড়ীতে। বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য ও ভাষার অনুশীলন হতো সমান ভাবেই

এই পরিবারের মধ্যে। গান-বাজনা, নৃত্য, অভিনয়, ছবি আঁকা, কুস্তি-খেলা, কোন কিছুরই অভাব ছিল না এ বাড়ীতে। সবার উপরে ছিল এই পরিবারের দেশভক্তি, ভদ্র আচরণ ও বিশিষ্ট ধরণের চাল-চলন।

এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, যাঁর জ্ঞানের ও গুণের কথা সেকালে বিলাত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এঁরই সুযোগ্য পুত্র ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাম শুনেই তোমরা বুঝতে পারছ, তিনি ঋষিতুল্য লোক ছিলেন। তিনি যে ঋষিতুল্য লোক ছিলেন তা' তাঁর জীবনের একটি ঘটনার কথা বললেই বুঝতে পারবে।

তাঁর পিতা ৺দ্বারকানাথের অসামান্য দানশীলতার জন্য বহু লক্ষ টাকা ঋণ হয়েছিল। সেই ঋণ রেখেই তিনি মারা যান।

এই ঋণের টাকা না দিলেও তিনি আইনে আবদ্ধ হ'তেন না; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি পাওনাদারগণকে ডাকিয়ে বল্লেন, "আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি পিতার ঋণ-পরিশোধের জন্য তোমাদের হাতে দিলাম। তোমরা ভাগ করে' নিয়ে আমার স্বর্গগত পিতাকে ঋণ হ'তে মুক্তি দাও"। এই বলে' তিনি তাঁহার হাতে যে বহুমূল্য হীরার আংটিটি ছিল সেটাও তা'দের হাতে দিলেন। মহর্ষির এই অপূর্ব্ব মহত্ব দেখে পাওনাদারগণ এমনি মুগ্ধ হ'য়ে গেল যে, তারা সমস্বরে বল্‌ল, তারা কেউ এক পয়সাও নেবে না। তারা উদারতা দেখিয়ে চলে' গেল বটে, কিন্তু মহর্ষি পিতার এক কোটি টাকার উপর ঋণ সব শোধ করে' দিলেন কিছুদিনের মধ্যেই।

এই মহাপুরুষের সপ্তম পুত্র আমাদের 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ'।

১২৮৬ সালের ২৫শে বৈশাখ। বাঙ্গালীর কাছে এই দিনটি চিরস্মরণীয়। এই শুভদিনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তাঁদের জোড়া-সাঁকোর বাড়ীতে। বাঙ্গালী যতদিন নিজেকে বাঙ্গালী বলে গৌরব বোধ করবে, ততদিন এই ২৫শে বৈশাখকে সে স্মরণ করবে শ্রদ্ধানতশিরে।

বাল্যকাল

এত বড় যে কবি, এত বিরাট যে পুরুষ তোমাদের দেশে জন্মেছিলেন, তাঁর বাল্যজীবন সম্বন্ধে জানবার জন্য নিশ্চয় তোমাদের একটা বিপুল আগ্রহ হচ্ছে। কিন্তু তাঁর জীবনের কত কথাই যে জানবার মত, শোনবার মত আছে তা কি এত অল্প কথায় বলা যায়? তোমরা বড় হ'য়ে মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে জীবন-ভ'র তাঁর কথা শুনো, তাঁর অফুরন্ত কাব্য-সাহিত্য প'ড়ো—জীবন সার্থক হবে।

সাধারণের চোখে দেখলে মনে হবে রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবন কেটেছে নিতান্ত সাধারণ, নিতান্ত সাদা-সিধে ভাবে। কেটেচেও তাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে দেখলে, দেখতে পাবে কত বিচিত্র কাহিনীতে ভরা আছে তাঁর ঐ শৈশবের দিনগুলি। তখন শিশু রবীন্দ্রনাথ সবে হাঁটি-হাঁটি পা'-পা' এর পর্য্যায় ছেড়ে' স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করতে শিখেছেন। ইচ্ছা করলেই তখন ছুটে মায়ের কাছে যেতে পারতেন, বাইরে বেরিয়েও একটু-আধটু বেড়াতে পারতেন। কিন্তু তা'ত হবার জো ছিল না। ঠাকুর-বাড়ীর নিয়মই ছিল অন্যরকম, শিশুমহলের ভার থাকত বাড়ীর পুরাতন ও প্রবীণ চাকর-বাকরের উপর। তারাই ছিল শিশুদের সত্যকার অভিভাবক অর্থাৎ গার্জ্জেন। কাজেই তাদের হুকুম ছাড়া যখন-তখন, মা-কাকিমাদের কাছে ছুটে যাওয়ার উপায় ছিলনা ছেলেদের। শিশুদের থাকবার ব্যবস্থাও ছিল ঐ চাকর-মহলেই। চাকর-বাকরও যে সব সময় তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করতো, তাও ঠিক বলা যায় না। মোট কথা, সেকালে ঠাকুরবাড়ীর ছেলেদের চাকর-মহলে একরকম আধা-জেলখানাতেই কাটাতে হতো সারা শৈশবটা। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও সে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁকেও শৈশবে একরকম বন্দী অবস্থাতেই থাকতে হতো চাকরদের ঘরে। যে ঘরটায় তাঁকে

থাকতে হ'তো, সেটির দক্ষিণদিকে ছিল একটি জানালা। সেই খোলা জানালাটাই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনার পথ। আর সেই জানালার ভিতর দিয়ে বাইরের যা' কিছু শোভা তাঁর চোখে পড়ত। সেইটুকুই ছিল তাঁর ঐ বন্দী-জীবনের একমাত্র সঙ্গী। তারই ভিতর দিয়েই এই ভাবি কবির পরিচয় হয় প্রকৃতির সঙ্গে।

চাকর-গার্জ্জেনেরা তাঁকে নিয়ত যে কিরূপ কড়া শাসনে রাখত, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা' লিখে গেছেন—"আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ী। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখে তর্জ্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাইরে গেলেই বিপদ।"

এমনি ভাবে বন্দিদশা অবস্থায় কেটেছিল রবীন্দ্রনাথের সারা শৈশবের দিনগুলি।

তারপর আগামীকালের কবি শিশু-রবীন্দ্রনাথের আহার-বিহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা সেকালে কেমন ছিল সেটাও একটু জানা ভাল; কারণ তোমরা মনে করতে পার, অত বড় বাড়ী, অত বড় বুনিয়াদি পরিবার, তার উপর রাজার মত ধন-সম্পত্তি; সেই বাড়ীর ছেলে! না-জানি কত সুখেই কাটতো তাঁর দিন। হয়ত দিন-রাত লুচি-সন্দেশ, ক্ষীর-মেঠাই খেতো, আর রাজপুত্তুরের মত দামী পোষাক পরে' গাড়ী-ঘোড়ায় চড়েই বেড়াতো যখন খুসী—কিন্তু ব্যাপারটা ছিল ঠিক তার উল্টো। সে সময়ে ঠাকুরবাড়ীর ছেলেদের পোষাক-পরিচ্ছদে ও আহারে-বিহারে, সৌখিনতার গন্ধও ছিলনা। কাপড়-চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে, এখনকার গরীব ছেলেদেরও মন ব্যাজার হ'য়ে উঠবে তা' দেখলে। একটা শাদা জামা, একজোড়া চটি জুতা, আর একখানা সাদা-সিধে

কাপড়ই ছিল তাদের পরিচ্ছদ। এর বেশী কিছুনা। শীতকালে ঐ শাদা জামার উপর আর-একটা শাদা জামার ব্যবস্থা হ'তো। তাঁর 'ছেলেবেলা' নামক বইতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন—"বয়স দশের কোটা পার হইবার আগে কোন দিন কোন কারণেই মোজা পরি নাই। * * * আমাদের চাইতে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদের গতি-বিধি, বেশ-ভূষা, আহার-বিহার, আরাম-আমোদ, আলাপ-আলোচনা, সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম, নাগাল পাইতাম না। * * কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের কাছে দুর্লভ ছিল। বড়ো হইলে কোন-এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় অর্পণ করিয়াছিলাম।" বেশ-ভূষা সম্বন্ধেও যেমন, আহার-বিহার সম্বন্ধেও তেমনি; কোন বিষয়েই বাহুল্যের কোন অবকাশ ছিলনা। ছেলেদের জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল চাকরদেরই হাতে। মা-পিষিমাদের আদর-আপ্যায়নের সুযোগ ছিলনা মোটই। কাজেই এবিষয়েও তা'দের নির্ভর করতে হ'তো চাকরদের খুশীর উপরে। বেশ-ভূষা ও খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে যে ভাবে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবন কেটেছিল, আজকাল-কার গরীবের ঘরের ছেলেদের পক্ষেও সেভাবে কাটান শক্ত।

শিক্ষারম্ভ

তারপর শিশু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আরম্ভ। লেখা-পড়া শেখা বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ সাধারণ বালকের মত ছিলেননা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা আরম্ভ হয় অতি শৈশবেই এক গুরুমহাশয়ের কাছে। বাড়ীর চণ্ডিমণ্ডপের পাঠ-শালায় রবীন্দ্রনাথ, তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথ ও তাঁর বড়দিদির ছেলে সত্য-প্রসাদ—তিন জনে লেখা-পড়া আরম্ভ করেন প্রায় সমকালেই। গুরুমহা-শয়ের কাছেই আর সব ছেলে পড়ে মনোযোগ দিয়ে—কেওবা ভয়ে,

কেওবা ভক্তিতে; কিন্তু আমাদের ভাবীকবির ওদু'টোর কোনটাই ছিলনা। পড়াতেই ছিল তাঁর যত আপত্তি। পড়ার জন্য যদি বা চাকরদের গণ্ডি থেকে ছুটি পেতেন; কিন্তু তাতে তাঁর নিস্তার ছিলনা; আবার তাঁকে পড়তে হ'তো পাঠশালার নূতন গণ্ডির মধ্যে। যা'হোক গুরুমহাশয়ের কাছে অতিকষ্টে 'কর, খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছালেন।

কিন্তু এই 'জল পড়ে' আর 'পাতা নড়ে' কথা দু'টির মধ্যে মিলের ধ্বনি যে আমাদের শিশু-কবির কাণে গিয়ে পৌছালো—তা' কিন্তু সেখানেই থামলো না—সে ধ্বনি কবির "কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল" এবং তাঁর মন-প্রাণকে কি যেন অজানা আনন্দে আকুল করে' তুললো। কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি গ্রন্থে' লিখেছেন,—"সেদিন পড়িতেছি 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা"।

তাঁর পাঠশালার সঙ্গী দাদা সোমেন্দ্র ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ যখন বাড়ীর পাঠশালা ছেড়ে ইংরাজী ইস্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হলো—তখন তাঁর মনটা গেল বিগড়ে। তাঁরও ঝোঁক হলো ইস্কুলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু অতি শিশু বলে' তাঁকে ইস্কুলে দেওয়া হলোনা। এদিকে সোমেন্দ্র ও সত্যপ্রসাদ গাড়ী চড়ে' ইস্কুলে যায়, আবার ইস্কুল থেকে এসে কতরকম গল্প করে। শুনে শুনে রবীন্দ্রনাথের মন অস্থির হয়ে' উঠে ইস্কুলে যাওয়ার জন্যে। পড়া যত হোক না হোক—চাকরদের ও পাঠশালার বন্দীশালা হ'তে সে যে বহুক্ষণের জন্য মুক্তি পাবে, বাইরের কত জিনিষের সঙ্গে তার পরিচয় হবে—এই আশায় ঘরে তাঁর মন আর কিছুতে টিকৃতে চাইলনা। শেষে শিশু রবীন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে কান্না আরম্ভ করলেন। শেষ পর্য্যন্ত কান্নার জোরেই তিনি ভর্ত্তি হ'লেন গৌরমোহন আঢ্যের 'ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী' নামক ইস্কুলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা' দেখলেন,

তা'তে তাঁর সব উৎসাহ গেল উড়ে'। সেখানে দেখলেন, পড়ার চাইতে শাসনের তোড়জোড়ই বেশী। তার উপর দু'একজন শিক্ষকের অতি অশিষ্ট ব্যবহার তাঁকে যেন উত্যক্ত করে' তুলেছিল। যা' হোক সেখানে তাঁকে বেশীদিন থাকতে হয়নি।

পাঠ্য-জীবন

ওরিয়েন্ট্যাল্ সেমিনারী থেকে এনে তাঁকে ভর্ত্তি করে' দেয়া হল নর্ম্যাল স্কুলে। উনুনের উপরের কড়াই থেকে ছিট্‌কিয়ে আগুনে পড়লে কৈ-মাছের যে অবস্থা হয়, রবীন্দ্রনাথেরও হ'লো সেই অবস্থা। নরম্যাল্ স্কুলের অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব তাঁর কাছে এমন অশুচি ও অপমান-জনক বোধ হয়েছিল যে, স্কুলে আসার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর মনে যেন যন্ত্রণার ভাবই থাকতো। তার উপর সেখানকার জনৈক শিক্ষকের ভাষা ও ব্যবহার এত কুৎসিত ছিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই ইস্কুলের উপর তাঁর দারুণ বিতৃষ্ণা জন্মে গেল।

ইতিমধ্যেই আমাদের ভাবি-কবির সাহিত্য-চর্চ্চার সূত্রপাত হয়েছিল তাঁদের চাকর-মহলে, সে-সময়ে যে-সকল বই প্রচলিত ছিল তাই নিয়ে। তার মধ্যে প্রধান ছিল, কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ। রামায়ণ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ এমন তন্ময় হ'য়ে যেতেন যে, তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো।

এই নর্ম্যাল্ স্কুলেই পড়বার সময়ে তাঁর কবিতা লেখার সূত্রপাত হয়। তখন তাঁর বয়স সাত কি আট হবে। এই সময়ে একদিন তাঁর এক জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় তাঁকে ডেকে কবিতা লিখবার রীতি-পদ্ধতি শিখিয়ে দেন।

এরপর থেকে তাঁর কবিতা লেখার দিকে ভয়ানক ঝোঁক চেপে যায়। তাঁদের কোন কর্ম্মচারীর কাছ থেকে তিনি একখানা নীল কাগজের খাতা

জোগাড় করেন। তারপর পেন্সিল দিয়ে এই নীল খাতায় লাইন টেনে, বড়-বড়, মোটা-মোটা অক্ষরে পদ্য লিখতে আরম্ভ করেন। এই নীল খাতার রচনাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মালঞ্চের প্রথম কুসুম-তরু।

এরপর সুরু হয় বাহিরের জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ভাবিকালের কবিমনের খোরাক-সংগ্রহের। সেবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের খুব প্রাদুর্ভাব হয়। সেজন্য তাঁদের বাড়ীর সকলে গঙ্গার ধারে পেনেটির এক বাগানবাড়ীতে গিয়ে কিছুদিন বাস করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীর বন্ধনী ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের এই সর্ব্বপ্রথম বাহিরে আসা। যদিচ এখানে এসেও তাঁর অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় ছিলনা, তথাপি গঙ্গাতীরের সেই অপূর্ব্ব শোভা, বাগানের সেই পেয়ারাবনের পাশ দিয়ে গঙ্গা-প্রবাহের অন্তহীন কলরোল, যেন তাঁর বন্দী মনের সব বন্ধন খুলে দিল। তিনি মন-প্রাণ ভ'রে দেখতে লাগলেন, প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষে পাল-তোলা নৌকার হেলেদুলে যাওয়া, অন্তহীন আকাশে রঙ-বেরঙের মেঘের বিচিত্র খেলা—এম্নি আরও কত কি। এই সব ছবি তাঁর শিশুমনে তখন এমন গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল যে, বহু বহু বছর পরে আবার তারা দেখা দিয়েছিল তাঁর বহু কবিতায়।

পেনেটির বাগান থেকে ফিরে আবার তাঁকে যেতে হ'লো নর্ম্যাল্ স্কুলে। আবার সুরু হ'লো তাঁর পড়া, সেই বিতৃষ্ণার মধ্য দিয়েই। এই সময়ে ইস্কুলে গিয়ে শিক্ষা বা অশিক্ষা যা' হবার তা'ত হ'তোই, বাড়ীতে এসে তাঁকে শিখতে হ'তো অনেক বেশী জিনিষ। বাড়ীর শিক্ষার বিষয়ের বেশীর ভাগই শেখান হ'তো তাঁর দাদা হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে।

প্রতিদিন নিয়মিতভাবে অতি প্রত্যুষে উঠে লেঙট্ পরে,' মাটি মেখে কুস্তি করতে হ'ত এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে। কুস্তির পর সেই মাটি-মাখা দেহে জামা পরে' বাড়ীতে নীলকমল মাষ্টারের কাছে বেলা সাড়ে

নটা পর্য্যন্ত শিখতে হ'তো পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, গণিত, ইতিহাস আর মেঘনাদবধ কাব্য। তারপর খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর স্নানাহার শেষ করে' তাঁকে যেতে হ'তো ইস্কুলে। আবার ইস্কুল থেকে আসার কিছুক্ষণ পরেই শিখতে হ'তো ড্রয়িং ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা ব্যায়াম। সন্ধ্যার পর আবার তাঁকে পড়তে হ'তো রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত। এই সময়ে শিক্ষা দেয়া হ'তো মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অস্থিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার যন্ত্রযোগে পরীক্ষা। তা'ছাড়া মাঝে মাঝে সঙ্গীতবিদ্যা ও ছবি আঁকাও শেখান হ'তো। এইভাবে ভোর থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত ছেলেদের চল্‌তে হ'তো বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্য দিয়ে। অনেকের মুখে শুনা যায় রবীন্দ্রনাথের স্কুল-কলেজের শিক্ষা কিছুই ছিলনা বল্‌লেই হয়। কথাটা সত্য ; কিন্তু তাঁর বাড়ীতে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, অনেক স্কুল-কলেজে পড়ুয়ার ভাগ্যে তা হয়নি, এবং বাড়ীতে পড়ে' তিনি যে শিক্ষালাভ করেছিলেন ও যে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন, স্কুল-কলেজের শেষ পরীক্ষায় পাশ-করা অনেক ছেলের পক্ষেই তা সম্ভব হয়নি !

কবির শৈশবে কিন্তু সকলের মুখেই শোনা যেতো "ওর কিছুই হবেনা।" কিন্তু ওঁর সত্যি সত্যি 'কীযে হবে' আর 'কীযে হবেনা' তা' এক অন্তর্য্যামী ছাড়া, বোধ করি, আর কেওই জানতেন না তখন। পড়তে গেলেই যাঁর ঘুমে চোক জড়িয়ে আসত, মাষ্টার পণ্ডিত দেখলেই যাঁর মন ব্যাজার হয়ে উঠতো, আর পড়া থেকে ছুটি পেলেই যাঁর খুশীর সীমা থাকতোনা, তাঁর ভিতর যে আগামী যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা লুক্কায়িত ছিল, তা' কেই বা জানতো ? যা হো'ক নর্ম্যাল ইস্কুলে এক বছর পড়ার পর, যে বাৎসরিক পরীক্ষা হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্থান অধিকার করায় সেখানে তাঁর একটু সুনাম হয়—যদিচ তাঁর প্রথম স্থান অধিকার করা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে একটু গোলমালও হয়। যাই হো'ক ঘটনা-

চক্রে সেখানেও পড়া তাদের আর চল্‌লোনা। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন কোন কারণে বুঝ্‌তে পারলেন—বাংলা ইস্কুল হ'লেও ছেলেরা সেখানে ঠিক বাংলাভাষা শিখছেনা—যা' শিখছে সে না বাংলা, না সংস্কৃত। তাই তিনি তাঁদের তিনজনকেই নর্ম্ম্যাল ইস্কুল ছাড়িয়ে 'বেঙ্গল একাডেমী' নামক খৃষ্টানদের এক ইস্কুলে ভর্ত্তি করে' দিলেন।

এখানে এসে রবীন্দ্রনাথ যেন কতকটা স্বস্তিবোধ করলেন; তা'র একমাত্র কারণ, এখানে পড়ার চাইতে ছুটি ভোগ করবার সুবিধাটাই ছিল বেশী। যে কোন অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নেবার বিশেষ অসুবিধা ছিলনা। ছেলেদের বেতন পেলেই ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ও-সব বিষয়ে তত লক্ষ্য করতেন না।

এখানকার ছাত্রেরাও কম দুষ্ট ছিলনা এবং রবীন্দ্রনাথকে জ্বালাতেও কম করেনি। সময় সময় তিনি অত্যন্ত উত্যক্ত হয়েছেন সত্য, কিন্তু এদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা জন্মায়নি। কারণ এদের ব্যবহারে দুর্ব্বৃত্তের ভাব যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কোন অশুচিভাব বা অশ্লীলতা কিছু ছিল না। কবি বলেছেন—'এখানকার ছেলেরা ছিল দুর্ব্বৃত্ত, কিন্তু ঘৃণ্য ছিলনা * * * এ সকল উৎপীড়ন গায়েই লাগে, মনে ছাপ দেয়না—এ সমস্তই উৎপাত মাত্র, অপমান নহে।"

উপনয়ন ও বিদেশ ভ্রমণ (বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয়)

১২৭৯ সালের মাঝা-মাঝি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরে এলেন। বাড়ী এসেই তিনি সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের উপনয়নের আয়োজন করলেন। নবপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়ম অনুসারে তাঁদের উপনয়ন সমাধা হলো। নূতন পৈতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অতি ভক্তি সহকারে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করলেন ঠিক ব্রহ্মচারীর মত;

কিন্তু মুস্কিল হ'লো ইস্কুল যাওয়া নিয়ে। পৈতে হওয়ার সময়ে তাঁকে যে মাথা মুড়াতে হয়েছিল, সেই ন্যাড়ামাথা নিয়ে ইস্কুলে যাবেন কি করে' সেই হ'ল তাঁর ভাবনা। তাতে খৃষ্টান্ সাহেবদের ইস্কুল। যাক্, দৈব কৃপা করে' তাঁকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। হঠাৎ তাঁর পিতা তাঁকে হিমালয়-ভ্রমণে নিয়ে যেতে চাইলেন। যিনি জীবনে কোনদিন বিদেশ কাকে বলে জানবার অবসর পাননি; কলকাতার কয়েকটি জায়গা এবং পেনেটির বাগানবাড়ী ছাড়া যাঁর আর কোন স্থান দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, তাঁর পক্ষে হিমালয়-যাত্রার সংবাদ অপেক্ষা বড় সংবাদ আর কি হ'তে পারে। তিনি আনন্দে আত্মহারা হ'লেন; যদিচ বাবার কাছে মুখ ফুটে কোন কথাই বলতে পারলেন না।

তখন তাঁর বয়স এগার বছর। এই তাঁর জীবনে প্রথম বিদেশযাত্রা। এই তাঁর জন্য প্রথম পোষাক তৈয়ারির ব্যবস্থা হ'ল।

কলকাতা হ'তে বেরিয়ে তাঁরা প্রথমে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কয়েক-দিন থাকলেন। যে শান্তিনিকেতন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম কর্ম্মকেন্দ্র ও সাধন-পীঠ হয়, বালক রবীন্দ্রনাথ এগার বৎসর বয়সে সেই শান্তিনিকেতনে এই প্রথম এলেন। শান্তিনিকেতনে এসে প্রকৃতির শিশু রবীন্দ্রনাথ যেন প্রকৃতির কোলে পেলেন অফুরন্ত আনন্দ। এইখানে তিনি 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। তার পর পিতাপুত্রে আবার ভ্রমণে বাহির হন। উত্তর ভারতের নানাস্থানে ঘুরে দীর্ঘ চারমাস পর কিশোরী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় ফিরে আসেন। এই ভ্রমণ হ'তে ভাবী কবি অফুরন্ত মনের খোরাক সংগ্রহ করে আনেন; পরবর্ত্তীকালে যার নমুনা পাওয়া যায় তাঁর বহু লেখার মধ্যে। কলকাতায় ফিরে রবীন্দ্রনাথ আবার বেঙ্গল একাডেমিতে যেতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু ইস্কুলের পড়ায়

তাঁর মন ব'সল না কিছুতেই। চারমাস বিদেশের নানাস্থানে ঘুরে বিশ্বপ্রকৃতির যে বিচিত্র রূপ তার মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল তাই নিয়ে তাঁর মন হয়েছিল আকুল। বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে তাঁর অশান্ত মনকে আর আটকে রাখতে পারছিলেন না তিনি। ইতিমধ্যে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটায় তাঁর মনটা যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

কাব্য-সাধনা আরম্ভ

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা লেখা আরম্ভ হয় সেই নীলখাতায়। অল্পদিনের মধ্যেই শিশুকবির বিচিত্র রচনায় সে খাতা পরিপূর্ণ হয়। তারপর ইস্কুলে পড়ার ও বাড়িতে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার বিরাম ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাব্যে হাতে খড়ি হয় বয়স যখন তাঁর বার-তের। এই সময়ে বালক কবি রবীন্দ্রনাথ সেকালের সাহিত্য ও প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বদাই খুঁজে বেড়াতেন আপন মনের তৃপ্তি ও আনন্দ এবং অবিরাম রচনা করে যেতেন নানা বিষয় নিয়ে কবিতা। সেই বয়সেই রবীন্দ্রনাথ যে কি সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন তা' পড়লে সত্যই অবাক হয়ে যেতে হয়। তিনি একটি কবিতায় লিখেছিলেন—

"ফুলবাস পরিয়া হাতে হাতে ধরিয়া
নাচি নাচি ঘুরি আসে কুসুমের রমণী
ফুলগুলি এলিয়ে উড়িতেছে খেলিয়ে
ফুল রেণু ঝরি ঝরি পড়িতেছে ধরণী॥

হিমালয়-ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে কবি যেন নূতন জীবনের আস্বাদ পেলেন পূরামাত্রায়। চাকরদের সে শাসন নাই; ইস্কুলে যাওয়ার বালাই নাই। বাড়িতে পড়াশুনার জন্য যে সকল মাষ্টার মশাই আসতেন তাঁরাও

আর তাঁকে পূর্ব্বের মত বাঁধতে বা তাড়া-হুড়ো করে' পড়তে বসাতে পারতেন না। খুশীমত বাড়ীর ভিতরে যাওয়া ও বাড়ীর মানুষের সঙ্গে মিশবারও তাঁর কোন বাধা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ যে লেখাপড়ার বাঁধা-ধরা গণ্ডি থেকে মুক্তি পেলেন তার কারণ, বোধকরি, তাঁর লেখা-পড়া কিছুই হবেনা বলে' সকলেই একরকম হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন, এইটেই। একথাটা কবি নিজেও লিখেছেন তাঁর 'জীবন-স্মৃতিতে'—"লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার, না আর কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোন কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন-মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।" এইভাবে ধীরে ধীরে শিশুকবির সমস্ত মন-প্রাণ আকাঙ্ক্ষা-অভিলাষ—সব যেন গিয়ে পড়লো কবিতা লেখার দিকে। ঘটনাচক্রে চারিদিকের অবস্থাটাও হ'ল তাঁর অনুকূল। বাড়ীতে তাঁর জ্যোতিদাদা ও তাঁর স্ত্রীর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন অফুরন্ত স্নেহ আর কবিতা রচনার উৎসাহ। সর্ব্বোপরি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয়টাই হ'ল তাঁর সাধনার বড় প্রেরণা। তাঁর বৌদিদি অর্থাৎ তাঁর জ্যোতিদার স্ত্রী ছিলেন বিহারীলালের কবিতার বড় ভক্ত। তাঁরই নিমন্ত্রণে কবি বিহারীলাল মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়ী আসতেন। এই সূত্রে বিহারীলালের সহিত আমাদের ভাবী-কবির পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। তিনি দিনে-দুপুরে, যখন তখন কবি বিহারীলালের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'তেন এবং নিবিষ্টমনে কবির মুখে কবিতা ও গান শুনতেন বিভোর হ'য়ে। এইভাবে তাঁর কবিতা রচনার স্রোত চল্‌লো অবাধ গতিতে।

এপর্য্যন্ত তিনি যে সকল কবিতা বা যা'-কিছু লিখেছিলেন তার কোনটিই ছাপা হয়নি ; নিজেদের মধ্যেই সেগুলির পাঠক বা শ্রোতা সীমাবদ্ধ

ছিল। এর পর যখন তাঁর বয়স চৌদ্দ, তখনই হয় তাঁর কাব্য-জীবনের উষা। 'বনফুল' ও 'প্রলাপ' এবং 'ভুবনমোহিনী-প্রতিভা'র সমালোচনা প্রভৃতি তাঁর এসময়ের রচনা। 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় এই সময় হ'তে তাঁর রচিত কবিতা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হ'তে থাকে। এরপর তাঁর 'কবিকাহিনী' 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'কাল-মৃগয়া', 'শৈশবসঙ্গীত', এবং 'করুণা' উপন্যাস প্রভৃতি রচনা ক্রমশঃ প্রকাশিত হ'তে থাকে। পরবর্ত্তী কালে এগুলির ভিতর কয়েকটি কবির কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এগুলি সবই কবির অপরিণত বয়সের লেখা। তারপর ১২৮৪ সালে 'ভারতী' নামক মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত ভাবে লিখতে আরম্ভ করেন। 'ভারতী'তে তিনি মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের যে সমালোচনা করে-ছিলেন তা' শুধু রচনা হিসাবেই উৎকৃষ্ট নয়, তরুণ লেখকের অসাধারণ সাহিত্যিক-বিচারশক্তির পরিচায়কও বটে।

কবির বয়স যখন ষোল সেই সময় থেকেই আরম্ভ হয় তাঁর কাব্য-জীবনের সত্যকার প্রত্যূষ। কারো কারো মতে কবির প্রকৃত কাব্য-জীবন আরম্ভ হয় তাঁর বয়স যখন বিশ বছর সেই সময় থেকে।

এই প্রসঙ্গে 'হিন্দুমেলার' কথাটা না বল্‌লে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি স্মরণযোগ্য কথা বাদ পড়ে' যায়, কাজেই 'হিন্দুমেলার' কথাটাও কিশোর পাঠকদের জানা দরকার। এই সময়ে ঠাকুরবাড়ীর উদ্যোগে 'হিন্দুমেলা' নামে একটা মেলা সৃষ্টি হয়েছিল। এই মেলায় তখনকার দিনের প্রায় সকল মনীষীরাই উপস্থিত হতেন এবং দেশের স্তবগান, গীত, দেশ-প্রেমের কবিতা পাঠ হ'তো এবং দেশীয় শিল্প ও দেশীয় ব্যায়ামাদি প্রদর্শন করা হ'তো সেই মেলায়। ১২৮১ সালে বালক রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার' জন্য 'হিন্দু-মেলার উপহার' নামে একটি কবিতা

লিখে মেলায় পাঠ করেন। জনসাধারণের সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সম্ভব, এই প্রথম প্রকাশ। কবিতাটি তৎকালে ইংরাজী-বাংলায় লেখা 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে লিখতে সুরু করেন ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাস থেকে। তারপর ঐ সালের পৌষ মাস থেকে তিনি 'কবি-কাহিনী' নামে একখানি কাব্যো-পন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। এই 'কবি-কাহিনী' পড়লে বোঝা যায় অতি শৈশবকাল থেকেই প্রকৃতির সহিত কবির মনের কি নিবিড় যোগ ছিল এবং কবি গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, আকাশ-বাতাস, বৃষ্টি-ধারা প্রভৃতির সমস্ত খুঁটিনাটি খোঁজ-খবর রাখতেন। আরও বুঝতে পারা যায় কবি পরিণত বয়সে বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্ব-প্রেমের যে আদর্শ সম্মুখে রেখে তাঁর বিশ্বভারতীর রূপ দিয়েছিলেন এই 'কবি-কাহিনী'র মধ্যেও তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হয়ত তাঁর অজ্ঞাতসারেই এ ভাব তাঁর অন্তরে নিতান্ত অস্পষ্টভাবে জেগেছিল।

যে কবি-প্রতিভা ও চিন্তাধারা সেদিন অতি ক্ষীণ গিরিস্রোতের মত তাঁর অন্তরে জন্মলাভ করেছিল, কালে সেই স্রোত মন্দাকিনীধারার মত দিকে দিকে প্রবাহিত হ'য়ে শুধু 'গৌড়জনের' নয়, বিশ্বজনের কাব্য-রস-তৃষ্ণা মিটিয়েছে। তাঁর অসাধারণ মনীষা ও কবিপ্রতিভার নিকট জগদ্বাসী শ্রদ্ধা-নতশিরে অভিনন্দন জানিয়েছে! তোমরা যখন বড় হবে তখন এই বিরাট পুরুষের সৃষ্ট কাব্য-সুধা পান করে' জীবন ধন্য ক'রো।

সমাপ্ত

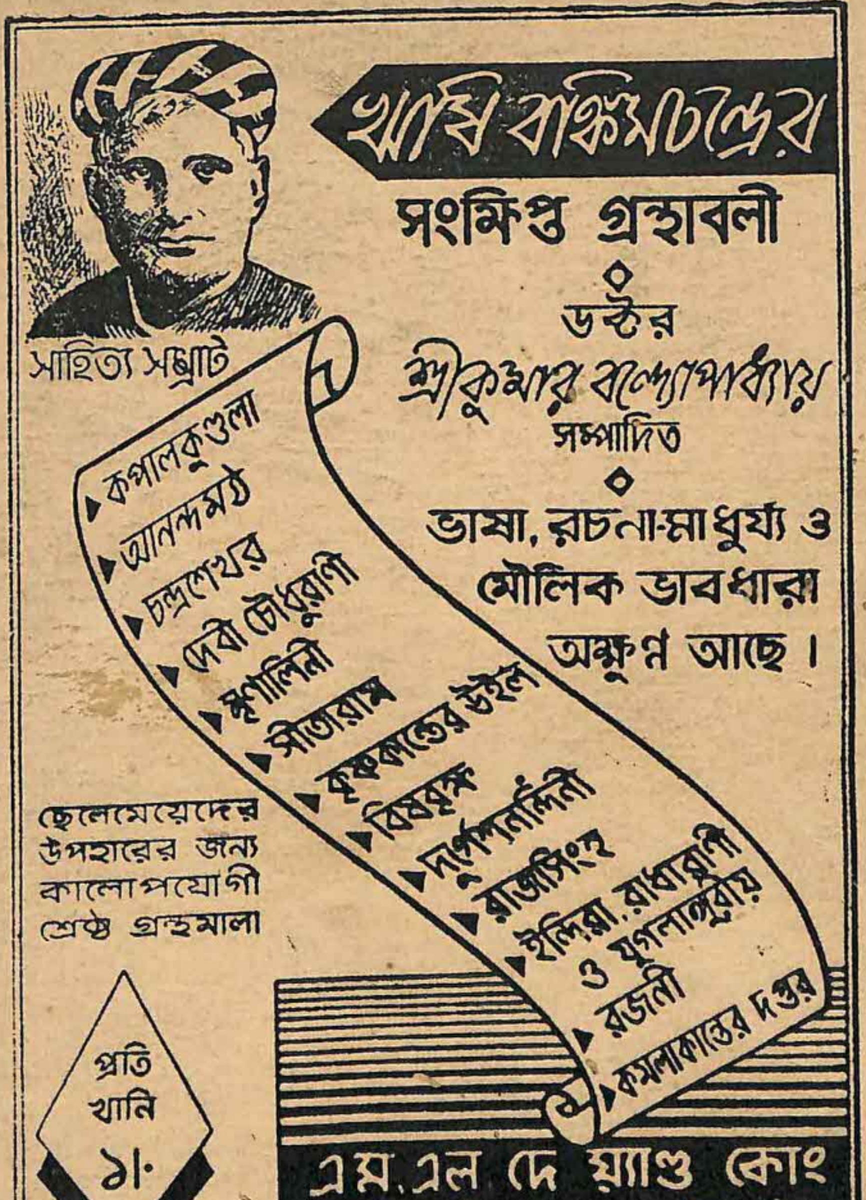
।। জাতীয়-সঙ্গীত ।।

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য-বিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি-তরঙ্গ,
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে ॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য বিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে ॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।

প্রকাশক—শ্রীহরিমোহন দে। ১৩/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শ্রীশ্যামসুন্দর ঘোষ। ঘোষ আর্ট প্রেস, ১৩৫এ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭


ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের
সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাবলী
ডক্টর
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত
ভাষা, রচনা-মাধুর্য্য ও
মৌলিক ভাবধারা
অক্ষুণ্ন আছে।
সাহিত্য সম্রাট
কপালকুণ্ডলা
আনন্দমঠ
চন্দ্রশেখর
দেবী চৌধুরাণী
মৃণালিনী
সীতারাম
কৃষ্ণকান্তের উইল
বিষবৃক্ষ
দুর্গেশনন্দিনী
রাজসিংহ
ইন্দিরা, রাধারাণী
ও যুগলাঙ্গুরীয়
রজনী
কমলাকান্তের দপ্তর
ছেলেমেয়েদের
উপহারের জন্য
কালোপযোগী
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থমালা
প্রতি
খানি
১৷·
এম. এল দে য়্যাণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৩-১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

মূল্য আট আনা মাত্র